





অনুবাদ • এস হক

প্রচ্ছদ • ক্যাটালগ

সহযোগিতায় • আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স

---

www.catalog.com.bd  
info@catalog.com.bd

---

### কপিরাইট © Catalog.com.bd

ইংরেজি মূল রচনাটি পাবলিক ডোমেইনভুক্ত। এই  
সংস্করণের বাংলা অনুবাদ, সম্পাদনা ও বিন্যাস  
Catalog.com.bd –এর স্বতন্ত্র সৃজনশীল কাজ।  
Catalog.com.bd –এর অনুমতি ব্যতীত এই বাংলা  
অনুবাদ বা এর বিন্যাসকৃত সংস্করণের অনুলিপি  
পুনঃপ্রকাশ বা বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত  
নয়।

## উইচ স্ট্রিট কোথায় ছিলো?

স্টেসি অমোনিয়ার

ওয়াপিংয়ের ‘ওয়াগটেইল’ পানশালার সাধারণ  
বারে চারজন পুরুষ ও একজন নারী বিয়ার খেতে  
খেতে নানা রোগ নিয়ে আলোচনা করছিল।  
বিষয়টি মোটেই সুখকর ছিল না, আর সেখানে  
জড়ো হওয়া লোকজনকেও সুদর্শন বলা যায় না।  
নভেম্বরের অন্ধকার এক সন্ধ্যা; বারের মলিন  
আলো বাইরের বিবর্ণ পরিবেশকে যেন আরও  
স্পষ্ট করে তুলেছিল। বাইরে থেকে ভেসে আসা  
কুয়াশা ও সঁাতসেঁতে বাতাস তামাকের ধোঁয়ার  
সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।

মেঝেতে ছড়ানো বালু পায়ের আঘাতে কাদার  
মতো হয়ে উঠেছে—রাস্তার ফুটপাথের চেয়ে খুব  
একটা ভালো নয়। আগের সন্ধ্যায় রাস্তার এক  
বৃদ্ধা নিউমোনিয়ায় মারা গিয়েছিলেন, আর সেই  
ঘটনাই আলোচনার জন্য প্রচুর খোরাক  
জুগিয়েছিল। কী সব রোগ চারদিকে!

সর্বত্র মানুষকে ধ্বংস করার জন্য ওত পেতে  
আছে জীবাণু। যেকোনো মুহূর্তে রোগের লক্ষণ  
দেখা দিতে পারে। তাই মানুষ বন্ধুদের সঙ্গে

কোনো আনন্দময় জায়গায় জড়ো হয়, আর  
পানীয়ের সাহায্যে সব ভুলে থাকার চেষ্টা করে।

এই ছোট্ট দলের মধ্যে সবচেয়ে চোখে পড়ার  
মতো ছিল বাল্ডউইন মেডোজ—হলদেটে মুখ,  
খঁতলানো চেহারা, উঁচু গালের হাড়; শত শত  
মারামারির দাগে তার মুখ ক্ষতবিক্ষত। একসময়  
নাবিক, তারপর মুষ্টিযোদ্ধা, তারপর মাছের  
আড়তে মালবাহক—সবার জানা মতে, জীবনে  
এমন কোনো কাজ নেই যা সে একসময় করেনি,  
আবার এমন কোনো কাজও নেই যেখান থেকে  
তাকে বাদ পড়তে হয়নি। এখন সে কীভাবে বেঁচে  
থাকে, কেউ জানত না। তার পাশে টলতে টলতে  
বসেছিল বিশালদেহী কৃষ্ণাঙ্গ হ্যারি জোন্স।  
বিয়ারের বড় পাত্রের ওপর দিয়ে দাঁত বের করে  
হাসছিল ব্রণভরা মুখের এক যুবক, যার পরিচিত  
নাম ‘দ্য এজেন্ট’।

আঙুলে রূপোর আংটি থাকলেও তার আর  
কোনো নাম ছিল না, আর ঠিকানা তো  
একেবারেই না। সে লোকজনের জন্য ‘ব্যবস্থা  
করে’ দিত এবং সেই কাজেই কোনোমতে,  
পালিয়ে বেড়ানোর মতো জীবনযাপন করে, টিকে  
থাকত। বাকি দুজন ছিলেন মিস্টার ও মিসেস

ডস। মিস্টার ডস ছিলেন একেবারেই নিষ্প্রভ  
মানুষ; কিন্তু মিসেস ডসের ছিল উঁচু, নাকিসুরে,  
একটানা ও জেদি কণ্ঠস্বর—হিস্টিরিয়ার মাত্রা  
থেকে যেন আধা সুর নিচে।

একসময় কথাবার্তা হঠাৎ অদ্ভুত দিকে মোড়  
নিল। মিসেস ডস বললেন, তাঁর এক খালা টিনের  
কৌটায় রাখা গলদা চিংড়ি খেয়ে মারা  
গিয়েছিলেন; সেই খালা একসময় উইচ স্ট্রিটের  
একটি করসেটের দোকানে কাজ করতেন।  
কথাটা শুনে দ্য এজেন্ট—যার ডান চোখ যেন  
ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকত, আর বাঁ চোখ  
পাত্রে ওপার দিয়ে অন্যদিকে—জিঙেস করল,  
“উইচ স্ট্রিট কোথায় ছিল, মা?”

“আরে!” মিসেস ডস অবাক হয়ে বললেন।  
“তুমি জানো না, সোনা? তুমি তো একেবারে  
বাচ্চা! আমি যখন মেয়ে ছিলাম, তখন সবাই উইচ  
স্ট্রিটের নাম জানত। কিংসওয়ে যেখানে তৈরি  
হয়েছে, ঠিক সেদিকেই ছিল।”

বাল্ডউইন মেডোজ গলা খাঁকারি দিয়ে বলল,  
“উইচ স্ট্রিট ছিল একটা সরু গলি—লং একর  
থেকে ওয়েলিংটন স্ট্রিট পর্যন্ত গেছে।”

“না, বন্ধু,” মিস্টার ডস বাধা দিলেন। তিনি এই প্রাক্তন-সব-পেশার লোকটিকে যথেষ্ট সমীহ করতেন। “আমার যতদূর মনে পড়ে, উইচ স্ট্রিট ছিল পুরোনো গ্লোব থিয়েটারের পেছনের সরু পথ, গির্জার পাশ দিয়ে চলে গিয়েছিল।”

“আমি কী বলছি, তা আমি জানি,” মেডোজ গর্জে উঠল।

মিসেস ডস নাকিসুরে গলায় বললেন, “এই যে, মিস্টার বুথ! আপনি তো একসময় জায়গাঘাট ভালো চিনতেন। বলুন তো, উইচ স্ট্রিট কোথায় ছিল?”

পানশালার মালিক মিস্টার বুথ কলের মুখ মুছছিলেন। তিনি মাথা তুলে বললেন, “উইচ স্ট্রিট? হ্যাঁ, অবশ্যই চিনতাম। কোভেন্ট গার্ডেনের দিকে কাজ থাকলে ছেলেদের সঙ্গে সেখানে যেতাম। স্ট্র্যান্ডের সঙ্গে সমকোণে ছিল, ওয়েলিংটন স্ট্রিটের একটু পূর্ব দিকে।”

“না, তা নয়। ওটা স্ট্র্যান্ডের পাশ বরাবর ছিল, ওয়েলিংটন স্ট্রিটে পৌঁছানোর আগেই।”

কৃষ্ণাঙ্গ লোকটি আলোচনায় অংশ নিল না। তার কাছে এক রাস্তা আরেক রাস্তার মতোই—যতক্ষণ পেটের আরাম আর অন্যান্য প্রিয় ভোগের ব্যবস্থা আছে, ততক্ষণই হলো। কিন্তু বাকিরা বেশ তিক্ততা নিয়ে তর্ক চালিয়ে গেল।

কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগেই আরও তিনজন লোক পানশালায় ঢুকল। মেডোজ তাদের চিনে ফেলল। তারা ছিল ‘দ্য গ্যালোজ রিং’ নামে পরিচিত দলের সদস্য। দলের প্রত্যেকেই জেল খেটেছে, তবু তারা চাঁদাবাজি, ভয় দেখানো, দোকান থেকে চুরি এবং আরও কিছু অপরিণত অপরাধের লাভজনক কারবার চালিয়ে যাচ্ছিল। নেতা বেন অর্মিং রোদারহাইথে এক চীনা লোককে পিটিয়ে হত্যার অপরাধে সাত বছর জেল খেটেছিল।

ওয়াপিংয়ে ‘গ্যালোজ রিং’ জনপ্রিয় ছিল না, কারণ দলটি নিজেদের শ্রেণির লোকদের ওপরই বহু অত্যাচার চালিয়েছিল। মেডোজ আর হ্যারি জোন্স যখন একটু বেপরোয়া আনন্দ করতে চাইত, তখন তারা ওয়েস্ট এন্ডে যেত। তাদের চোখে ‘গ্যালোজ রিং’ ছিল ভদ্রতাহীন একদল লোক। তবু তারা দলটির সঙ্গে বাইরে থেকে ভদ্র

ব্যবহার করত—কারণ তাদের সঙ্গে ঝামেলায়  
জড়ানো মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ ছিল না।

বেন অর্মিং তার দুই সঙ্গীর জন্য বিয়ার অর্ডার  
করল। তারা বারের গায়ে হেলান দিয়ে নিচু গলায়  
কথা বলতে লাগল। মনে হচ্ছিল, তাদের কোনো  
পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে। মিসেস ডস বারের  
গুঞ্জনের ওপর দিয়ে আবার কথা বলতে  
লাগলেন। হঠাৎ বললেন, “বেন, তুমি তো ভারি  
রগচটা লোক! আমরা একটা আলোচনা  
করছিলাম। বলো তো, উইচ স্ট্রিট কোথায় ছিল?”

বেন ঞ্চ কুঁচকে তাকাল। মিসেস ডস বললেন,  
“কেউ বলে এক জায়গায়, কেউ বলে আরেক  
জায়গায়। আমি জানি কোথায় ছিল, কারণ  
আমার যে খালা টিনের গলদা চিংড়ি খেয়ে রক্তে  
বিষক্রিয়ায় মারা গিয়েছিলেন, তিনি করসেটের  
দোকানে কাজ করতেন—”

“হ্যাঁ,” বেন জোরে বলে উঠল, “আমি জানি উইচ  
স্ট্রিট কোথায় ছিল—নদীর দক্ষিণে, ওয়াটারলু  
স্টেশনে পৌঁছানোর আগেই।”

এবার এতক্ষণ চুপ থাকা কৃষ্ণাঙ্গ লোকটি কথা  
বলল। “না, ক্যাপ্টেন, তোমরা সবাই ভুল। উইচ

স্ট্রিট ছিল গির্জার পাশে, স্ট্র্যান্ড যেখানে পশ্চিম দিকে বাঁক নিয়েছে তার ওদিকে।”

বেন তার দিকে তেড়ে তাকাল। “একটা—” সে বর্ণবাদী গালি দিয়ে বলল, “তুই কী জানিস? আমি তোকে বলেছি, উইচ স্ট্রিট কোথায় ছিল।”

“হ্যাঁ, আর আমিও জানি,” মেডোজ বলল।

“তোমরা দুজনেই ভুল। উইচ স্ট্রিট ছিল লং একর থেকে ওয়েলিংটন স্ট্রিটে যাওয়ার গলি।”

“তোর মতামত আমি চাইনি,” বেন গর্জে উঠল।

“তাহলে কি আমার মত দেওয়ার অধিকার নেই?”

“তুই সবসময় ভাবিস, সবকিছু তুই জানিস।”

“তুই মুখ বন্ধ রাখ।”

“তোর মতো লোকের কথায় আমার মুখ বন্ধ হবে না।”

এই সময় মিস্টার বুথ বারের ওপার থেকে চৈঁচিয়ে বললেন, “ভদ্রলোকেরা, দয়া করে ঝগড়া করবেন না!”

হয়তো এখানেই ব্যাপারটা থেমে যেত, কিন্তু  
মিসেস ডসের কারণে তা হলো না। রাস্তার বৃদ্ধার  
মৃত্যুতে তাঁর আবেগ এতটাই আলোড়িত হয়েছিল  
যে, প্রায় অজান্তেই তিনি অতিরিক্ত জিন খেয়ে  
ফেলেছিলেন। হঠাৎ তিনি চিৎকার করে  
উঠলেন, “মিস্টার মেডোজ, ওর কথা শুনবেন  
না! নোংরা চোর-শয়তানটা ভাবে, সবাইকে বোকা  
বানিয়ে দেবে!”

তিনি হুমকির ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন। বেনের  
এক সঙ্গী তাঁকে আলতো করে পেছনে ঠেলে  
দিল। তিন মিনিটের মধ্যেই বারজুড়ে হুলস্থূল  
শুরু হয়ে গেল। ‘গ্যালোজ রিং’-এর তিন সদস্য  
দুজন পুরুষ ও একজন নারীর সঙ্গে মারামারিতে  
জড়াল; মিস্টার ডস শুধু এক কোণে দাঁড়িয়ে  
চিৎকার করতে লাগলেন, “করো না! করো না!”

মিসেস ডস চুলের কাঁটা দিয়ে যে লোকটি তাঁকে  
ঠেলে দিয়েছিল, তার কবজিতে খোঁচা মারলেন।  
মেডোজ ও বেন অর্মিং খালি হাতে ভয়ংকরভাবে  
লড়াই শুরু করল। শুরুতেই এক সৌভাগ্যজনক  
ঘুষিতে মেডোজ দেয়ালে ছিটকে পড়ল; তার  
কপালের পাশ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। তখন  
হারি জোন্স পিতলের নয়, টিনের তৈরি বিয়ারের

পাত্রটি বেনের দিকে ছুড়ে মারল; সেটি বেনের  
আঙুলের গাঁটে লাগল। ব্যথায় বেন উন্মত্ত হয়ে  
উঠল। তার আরেক সঙ্গী হ্যারির সঙ্গে কুস্তি  
ধরল, তারপর উঁচু স্টুল তুলে সুযোগ বুঝে  
কৃষ্ণাঙ্গ লোকটির মাথায় সজোরে আঘাত করল।

সবকিছু ঘটেছিল কয়েক মিনিটের মধ্যে। মিস্টার  
বুথ রাস্তায় দাঁড়িয়ে চৈতন্যহীন। শিস বেজে  
উঠল, মানুষ চারদিকে ছুটতে লাগল।

“পালাও! ঈশ্বরের দোহাই, পালাও!” কবজিতে  
ছুরিকাঘাত-খাওয়া লোকটি চিৎকার করল। তার  
মুখ ফ্যাকাশে, দেখে মনে হচ্ছিল যেকোনো  
মুহুর্তে অজ্ঞান হয়ে যাবে।

বেন ও টলার নামের অন্য লোকটি দরজার দিকে  
ছুটল। ফুটপাতে বিশৃঙ্খল ধস্তাধস্তি শুরু হলো;  
যে যাকে পারল আঘাত করল। দুজন পুলিশ  
হাজির হলো। টলার হাঁটুর হাড়ে লাথি মেরে  
একজনকে অক্ষম করে দিল। দুজন অন্ধকারে  
পালাল, আর তাদের পিছু নিল চিৎকার করতে  
থাকা জনতা। এলাকাতেই জন্মে ও বড় হওয়ায়  
তারা নিজেদের পরিচিতির পুরো সুবিধা নিল।  
গলির পর গলি পেরিয়ে, অন্ধকার আস্তাবলের

পথ ধরে ছুটল, দেয়াল টপকাল। যাদের পাশ দিয়ে গেল, তারা ধাওয়া থামাতে বা পালাতে বাধা দিতে পারত; কিন্তু সবাই ঘরের ভেতর পালিয়ে গেল। ওয়াপিংয়ের লোকেরা সব সময় ধাওয়াকারীর পক্ষ নেয় না। পুলিশ অবশ্য পিছু ছাড়ল না। শেষ পর্যন্ত বেন ও টলার আজটেক স্ট্রিটের একটি খালি বাড়ির দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল—সবচেয়ে কাছের ধাওয়াকারী তখন তাদের থেকে মাত্র দশ গজ দূরে। দরজায় প্রচণ্ড আঘাত পড়ল, কিন্তু তারা খিল এঁটে মেঝেতে হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ল। কথা বলার শক্তি ফিরে পেয়ে বেন বলল, “ওরা যদি ধরে ফেলে, ফাঁসিতে ঝুলতে হবে।”

“কালো লোকটা কি মরেছে?”

“আমার তাই মনে হয়। কিন্তু সে না মরলেও, পরশু রাতের সেই অন্য কাণ্ডটা আছে। খেলা শেষ।”

নিচতলার ঘরগুলোর জানালা-দরজা বন্ধ করে আটকানো ছিল, কিন্তু তারা জানত পুলিশ সামনের দরজা ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করবে। পেছনে পালানোর কোনো পথ নেই—শুধু সরু

আস্তাবলের উঠোন, যেখানে ইতিমধ্যেই লণ্ঠনের আলো ঝলকাচ্ছে। ছাদ দুদিকে মাত্র ত্রিশ গজ পর্যন্ত বিস্তৃত; পুলিশ সেটিও দখল করে নিতে পারে। তারা বাড়িটা ঘুরে দেখল। আসবাবপত্র সামান্য: একখানা পাউরুটি, একটু মাটন, এক বোতল আচার, আর সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস— তিন বোতল হুইস্কি। প্রত্যেকে আধা গ্লাস খাঁটি হুইস্কি পান করল। তারপর বেন বলল, “যাই হোক, কিছুক্ষণ ওদের চুপ করিয়ে রাখতে পারব।” সে একটি পুরোনো বারো-বোরের বন্দুক ও এক বাক্স কার্তুজ নিয়ে এল। টলার এই শেষ মরিয়া পদক্ষেপের বিরোধিতা করল, কিন্তু বেন বিড়বিড় করে বলতে লাগল, “শেষ পর্যন্ত ফাঁসিতেই ঝুলতে হবে।”

এভাবেই শুরু হয়েছিল আজটেক স্ট্রিটের কুখ্যাত অবরোধ। তা চলেছিল তিন দিন চার রাত। মনে থাকতে পারে, ভি ডিভিশনের সাব-ইন্সপেক্টর রেইথ সামনের দরজার একটি প্যানেল ভাঙার সময় বুকে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। এরপর পুলিশ অন্য পদ্ধতি নেয়। পানির নল ব্যবহার করা হয়, কিন্তু তাতে ফল হয়নি। দুজন পুলিশ নিহত ও চারজন আহত হয়। সেনাবাহিনী ডাকা হয়। রাস্তায় পাহারা বসানো হয়, বিপরীত দিকের

বাড়িগুলোর জানালায় স্নাইপাররা অবস্থান নেয়।  
মন্ত্রিসভার এক বিশিষ্ট সদস্য মোটরগাড়িতে এসে  
উঁচু টুপি পরে অভিযান পরিচালনা করেন। শেষ  
পর্যন্ত বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করেই ওই দুর্গের  
পতন ঘটানো হয়। বেন অর্মিংয়ের দেহ কখনো  
পাওয়া যায়নি; তবে সামনের দরজার কাছে  
টলারের দেহ পাওয়া যায়, তার হৃদয়ে গুলি  
লেগেছিল। আদালতের চিকিৎসক জানান,  
লোকটি তিন দিন আগেই মারা গিয়েছিল।  
স্নাইপারের এলোপাতাড়ি গুলিতে সে মারা  
গিয়েছিল, নাকি তার অপরাধী সঙ্গী ইচ্ছাকৃতভাবে  
তাকে হত্যা করেছিল—তা আর জানা যায়নি।  
শেষ মুহূর্তে অর্মিং যেন প্রতিশোধের একটি চূড়ান্ত  
পরিকল্পনা করেছিল। জানা গিয়েছিল, বেসমেন্টে  
প্রচুর পেট্রল মজুত ছিল; সম্ভবত ওপরতলার  
সবচেয়ে দাহ্য জিনিসগুলোর ওপর তা ছড়িয়ে  
রাখা হয়েছিল। এক সাক্ষীর ভাষায়, আগুন  
ধরেছিল “প্রায় বিস্ফোরণের মতো”। অর্মিং  
নিশ্চয়ই সেই আগুনে পুড়ে মারা যায়। ছাদ  
দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে; স্ফুলিঙ্গ উঠোন  
পেরিয়ে মোরেলদের পিয়ানো কারখানার সংলগ্ন  
ভবনে রাখা হালকা কাঠের স্তুপে আগুন ধরিয়ে  
দেয়। কারখানা ও পাশাপাশি থাকা দুটি বহুতল  
আবাসিক ভবন সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। ক্ষয়ক্ষতির

আনুমানিক মূল্য ছিল এক লাখ আশি হাজার  
পাউন্ড। নিহত হয় সাতজন, আহত পনেরো জন।

প্রধান বিচারপতি পেঙ্গামনের অধীনে অনুষ্ঠিত  
তদন্তে বেশ কিছু অদ্ভুত ও আকর্ষণীয় তথ্য  
বেরিয়ে আসে। তরুণ ও মেধাবী কিংস  
কাউন্সেল মিস্টার লোয়েস-পার্বি বহু সাক্ষীকে  
জেরা করে নিজের দক্ষতার পরিচয় দেন।  
একপর্যায়ে মিসেস ডসকে সাক্ষ্য দিতে ডাকা  
হয়।

“মিসেস ডস,” লোয়েস-পার্বি বললেন, “আমি  
বুঝেছি, সেদিন সন্ধ্যায় আপনি, নিহত ব্যক্তির  
এবং আরও যাদের কথা বলা হয়েছে, সবাই  
‘ওয়াগটেইল’ পানশালার বারে বসে নিশ্চয়ই তার  
চমৎকার আতিথ্য উপভোগ করছিলেন এবং  
বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা করছিলেন। ঠিক কি না?”

“জি, স্যার।”

“আপনারা কী নিয়ে আলোচনা করছিলেন,  
বলবেন?”

“রোগ নিয়ে, স্যার।”

“রোগ! আর তর্ক কি তিক্ত হয়ে উঠেছিল?”

“কী বললেন?”

“রোগ নিয়ে কি গুরুতর বিবাদ হয়েছিল?”

“না, স্যার।”

“তাহলে বিবাদের বিষয় কী ছিল?”

“আমরা তর্ক করছিলাম, উইচ স্ট্রিট কোথায় ছিল।”

প্রধান বিচারপতি বললেন, “কী বললেন?”

লোয়েস-পার্বি ব্যাখ্যা করলেন, “সাক্ষী বলছেন, তাঁরা উইচ স্ট্রিটের অবস্থান নিয়ে তর্ক করছিলেন।”

“উইচ স্ট্রিট? বানান কি W-Y-C-H?”

“জি, স্যার।”

“আপনি কি সেই সরু পুরোনো রাস্তার কথা বলছেন, যা এখনকার গেইটি থিয়েটারের জায়গার ওপর দিয়ে গিয়েছিল?”

লোয়েস-পার্বি তাঁর সবচেয়ে আকর্ষণীয় হাসিটি হাসলেন। “জি, মাই লর্ড। সাক্ষী সম্ভবত সেই রাস্তাটির কথাই বলছেন। তবে আপনার বর্ণনায় সামান্য সংশোধনের অনুমতি চাই: রাস্তা সম্ভবত আরও কিছুটা পূর্ব দিকে ছিল—পুরোনো গ্লোব থিয়েটারের পাশে, যা স্ট্র্যান্ডের সেন্ট মার্টিন গির্জার কাছাকাছি ছিল। মিসেস ডস, আপনারা কি এই রাস্তাটির কথাই বলছিলেন?”

“স্যার, আমার খালা টিনের গলদা চিংড়ি খেয়ে মারা গিয়েছিলেন, আর তিনি করসেটের দোকানে কাজ করতেন। আমার তো জানা থাকার কথা।”

প্রধান বিচারপতি সাক্ষীকে উপেক্ষা করে কিছুটা বিরক্তির সঙ্গে আইনজীবীর দিকে ফিরলেন।

“মিস্টার লোয়েস-পার্বি, আমি যখন আপনার বয়সী ছিলাম, তখন জীবনের প্রায় বারো বছর প্রতিদিন উইচ স্ট্রিট দিয়ে যাতায়াত করেছি। আপনাকে আমার বিরোধিতা করতে হবে—এমনটা আমি মনে করি না।”

আইনজীবী মাথা নত করলেন। প্রধান বিচারপতির সঙ্গে তর্ক করা তাঁর কাজ ছিল না, যদিও বিচারপতি নিরেট বোকা হয়ে থাকেন। কিন্তু

আদালতের মাঝখান থেকে আরেকজন বিশিষ্ট  
কিংস কাউন্সেল—তামাটে দাড়িওয়ালা এক বয়স্ক  
ব্যক্তি—উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “মাই লর্ড,  
অনুমতি দিলে আমিও আমার যৌবনের অনেকটা  
সময় উইচ স্ট্রিট দিয়ে যাতায়াত করেছি। পুরোনো  
ও বর্তমান অর্ডন্যান্স সার্ভে মানচিত্র মিলিয়ে  
বিষয়টি পরীক্ষা করেছি। আমার ভুল না হলে,  
সাক্ষী যে রাস্তার কথা বলছেন, সেটি কিংসওয়ের  
প্রবেশমুখের বেড়ার কাছ থেকে শুরু হয়ে  
এখনকার অল্ডউইচ থিয়েটারের পেছনে গিয়ে  
শেষ হয়েছিল।”

“না, মিস্টার ব্যাকার!” লোয়েস-পার্বি বলে  
উঠলেন।

প্রধান বিচারপতি চশমা খুলে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন,  
“এই বিষয় মামলার জন্য সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক।”

নিশ্চয়ই তা-ই ছিল। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত  
বাক্যবিনিময় তিক্ততার একটি অস্বস্তিকর ছাপ  
রেখে গেল। লক্ষ্য করা গেল, এরপর থেকে  
লোয়েস-পার্বি আগের সাক্ষীদের জেরা করার  
সময় যে দৃঢ় দক্ষতা দেখিয়েছিলেন, তা আর  
ফিরে পেলেন না। হ্যারি জোন্স হাসপাতালে মারা

গিয়েছিল। মিস্টার বুথ, বান্ডউইন মেডোজ,  
মিস্টার ডস এবং কবজিতে খোঁচা খাওয়া  
লোকটি সাক্ষ্য দিলেও সেসব সাক্ষ্যের তেমন  
মূল্য ছিল না। লোয়েস-পার্বি সেগুলো দিয়ে  
কিছুই করতে পারলেন না। বিশেষ তদন্তের  
সিদ্ধান্ত এখানে আমাদের আলোচ্য নয়। শুধু  
এটুকু বললেই যথেষ্ট যে, উল্লেখিত সাক্ষীর সবারই  
ওয়াপিংয়ে ফিরে গেলেন। কবজিতে চুলের  
কাঁটার আঘাত পাওয়া লোকটি মিসেস ডসের  
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সমীচীন মনে করল না।  
সে স্বস্তি পেল যে তাকে শুধু ব্যর্থ এক তর্কের  
সাক্ষী হিসেবেই ডাকা হয়েছিল।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই লন্ডনের অধিকাংশ  
মানুষের কাছে আজটেক স্ট্রিটের সেই ভয়ংকর  
অবরোধ কেবল রোমাঞ্চকর স্মৃতিতে পরিণত  
হলো। কিন্তু প্রধান বিচারপতি পেঙ্গামনের সঙ্গে  
ছোট্ট মতবিরোধটি লোয়েস-পার্বির মনে  
অযৌক্তিকভাবে গেঁথে রইল। আপনি যে কথা  
সম্পূর্ণ সত্য বলে জানেন, এমনকি যাচাই করেও  
নিয়েছেন, সে কথা বলার জন্য প্রকাশ্যে ধমক  
খাওয়া বিরক্তিকর। লোয়েস-পার্বি ছিলেন এমন  
যুবক, যিনি জয়ী হতে অভ্যস্ত। প্রতিপক্ষের  
মুখোমুখি হওয়ার আগে সবকিছু খুঁজে দেখে,

ভালোভাবে প্রস্তুত হওয়া ছিল তাঁর অভ্যাস। তিনি এমন ভাব দেখাতে পছন্দ করতেন যেন সবকিছুই তাঁর জানা। সামনে অপেক্ষা করছিল যে উজ্জ্বল কর্মজীবন, তার ঝলক কখনো কখনো তাঁকে মোহিত করত। ভাগ্যদেবতাদের প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি; সবকিছুই যেন তাঁর অনুকূলে আসত। তাঁর বাবা তাঁর আগেই আইনজগতে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং মোটামুটি ভালো সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একমাত্র সন্তান। অক্সফোর্ডে সম্ভাব্য সব ডিগ্রিই অর্জন করেছিলেন। ইতিমধ্যেই তাঁকে উচ্চ রাজনৈতিক সম্মানের জন্য বিবেচনা করা হচ্ছিল। কিন্তু সাফল্যের মুকুটে সবচেয়ে ঝলমলে রত্নটি ছিলেন লেডি অ্যাডেলা চার্টার্স—পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড ভারমিয়ারের কন্যা। তিনি লোয়েস-পার্বির বাগদত্তা, আর এই বিয়েকে সে মৌসুমের সবচেয়ে চমকপ্রদ সম্বন্ধ বলে মনে করা হতো। অ্যাডেলা তরুণী, দেখতে প্রায় সুন্দরী; আর লর্ড ভারমিয়ার ছিলেন বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী এবং ব্রিটেনের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি। এমন সমন্বয় ছিল অপ্রতিরোধ্য। কিংস কাউন্সেল ফ্রান্সিস লোয়েস-পার্বির জীবনে যেন কোনো কিছুই অভাব ছিল না।

আজটেক স্ট্রিট তদন্তের নিয়মিত ও মনোযোগী  
দর্শকদের একজন ছিলেন বৃদ্ধ স্টিফেন গ্যারিট।  
সে সময় আইনজগতে তাঁর অবস্থান ছিল একক  
ও ব্যতিক্রমী, যদিও খুব বেশি চোখে পড়ত না।  
তিনি বিচারকদের বন্ধু, জটিল আইনি বিধানের  
বিশেষজ্ঞ, অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী—তবু  
ছিলেন অপেশাদার। তিনি কখনো অসুস্থতার ছুটি  
নেননি, আইনজীবীদের জন্য নির্ধারিত  
ভোজসভায় অংশ নেননি, জীবনে কোনো  
পরীক্ষাও পাস করেননি; কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণের  
আইন ছিল তাঁর কাছে অন্তর্জালের মতো।  
টেম্পলে নিজের কক্ষে তিনি জীবন কাটাতেন।  
বিশ্বের নামকরা অনেক আইনজীবী তাঁর মতামত  
নিতেন কিংবা পরামর্শ চাইতে আসতেন। তিনি  
ছিলেন অত্যন্ত বৃদ্ধ, নীরব ও গভীর মনোযোগী।  
আজটেক স্ট্রিট তদন্তের প্রতিটি অধিবেশনে  
উপস্থিত থাকলেও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত  
একবারও নিজে থেকে কোনো মতামত দেননি।  
  
তদন্ত শেষ হলে তিনি লন্ডন সার্ভে অফিসে তাঁর  
এক পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।  
সেখানে দুই সকাল ধরে মানচিত্র পরীক্ষা  
করলেন। এরপর আরও দুই সকাল স্ট্র্যান্ড,  
কিংসওয়ে ও অল্ডউইচের আশপাশে ঘুরে

বেড়ালেন। তারপর রেখাঙ্কিত কাগজে সতর্ক হিসাব কষলেন। এ ধরনের কাজের জন্য রাখা ছোট্ট খাতায় বিস্তারিত তথ্য লিখে নিজের কক্ষে ফিরে গেলেন, অন্য বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করার জন্য। তবে তার আগে আরেকটি খাতায় একটি ছোট্ট বাণী লিখে রাখলেন। মনে হলো, আইনি অভিজ্ঞতার সারাংশ সংকলন করার জন্যই খাতাটি রেখেছেন। বাক্যটি ছিল: “মূল সমস্যা হলো, যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই মানুষ নানা বক্তব্য দিয়ে বসে।”

লর্ড ভারমিয়ারের বাড়িতে এক নৈশভোজে একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছিল বলেই বৃদ্ধ সিটিফেনের এই গল্পে থাকা দরকার। আর পরিস্থিতি বিবেচনায় এমন মূল্যবান ও দক্ষ সাক্ষীর উপস্থিতি যে কাজে লাগে, তা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন।

লর্ড ভারমিয়ার ছিলেন দক্ষ ও দৃঢ়চেতা মানুষ, তবে কিছুটা বদমেজাজি ও স্বেচ্ছাচারী। তিনি ল্যাঙ্কাশায়ারের মানুষ; রাজনীতিতে আসার আগে বোরাঙ্ক, কৃত্রিম সার ও মাড়ের ব্যবসা করে বিপুল সম্পদ গড়েছিলেন।

সেদিনের নৈশভোজে অতিথি ছিলেন অল্প কয়েকজন, কিন্তু এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল। প্রধান অতিথি ছিলেন বঙ্কানের আমিরের লন্ডন প্রতিনিধি মিস্টার স্যাভিম্যান। লর্ড ভারমিয়ার তাঁকে মুগ্ধ করতে এবং তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলতে খুব আগ্রহী ছিলেন; কেন, তা পরে বোঝা যাবে। স্যাভিম্যান নিজেকে বিশ্বনাগরিক বলে পরিচয় দিতেন। তিনি সাতটি ভাষায় কথা বলতেন এবং দাবি করতেন, ইউরোপের যেকোনো রাজধানীতেই তিনি সমান স্বচ্ছন্দ। বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে লন্ডন ছিল তাঁর সদর দপ্তর। লর্ড ভারমিয়ার আরও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মন্ত্রিসভার সহকর্মী মিস্টার আর্থার টুস্বস, তাঁর সম্ভাব্য জামাতা লোয়েস-পার্বি, সংসদের এক অত্যন্ত নিরীহ সমাজতন্ত্রী সদস্য জেমস ট্রলি, এবং স্যার হেনরি ও লেডি ব্রেইডকে। স্যার হেনরিকে বিশেষ কাজে লাগবে বলে নয়, বরং তাঁর স্ত্রী লেডি ব্রেইড ছিলেন সুন্দরী ও বুদ্ধিদীপ্ত—যিনি প্রধান অতিথিকে আনন্দ দিতে পারবেন। ষষ্ঠ অতিথি ছিলেন স্টিফেন গ্যারিট।

নৈশভোজটি দারুণ সফল হয়েছিল। একের পর এক পদ পরিবেশন শেষ হলে এবং মহিলারা অন্য ঘরে চলে গেলে, লর্ড ভারমিয়ার পুরুষ

অতিথিদের দশ মিনিট ধূমপানের জন্য পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন, তারপর আবার মহিলাদের কাছে ফেরার কথা। সেই সময়ই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাটি ঘটল। লোয়েস-পার্বি ও মিস্টার স্যাভিম্যানের মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাব ছিল না। তাদের বিরোধের প্রকৃত কারণ বলা কঠিন, তবে যখনই দেখা হতো, তির্যক রসিকতা ও বিদ্রূপের এক নীরব লড়াই চলত। দুজনই বুদ্ধিমান, বয়সেও তুলনামূলক তরুণ; প্রত্যেকেই অন্যের প্রতিভা নিয়ে সন্দিহান এবং কিছুটা ঈর্ষান্বিত। আবার কেউ কেউ বলত, লর্ড ভারমিয়ারের মেয়ের প্রতি স্যাভিম্যানেরও আগ্রহ ছিল; তিনি প্রস্তাব দেওয়ার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন, এমন সময় লোয়েস-পার্বি এসে আগে ভাগিয়ে নেন। সেদিন স্যাভিম্যান ভালো করে খেয়েছিলেন এবং নিজের বিচিত্র জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রদর্শনী করে সবাইকে মুগ্ধ করার মেজাজে ছিলেন। কথাবার্তা বড় বড় শহরের শ্রেষ্ঠত্ব থেকে ধীরে ধীরে পুরোনো স্থাপনা ও পরিচিত চিহ্ন হারিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গে গড়াল। বুদাপেস্ট ও লিসবনের গুরুত্ব নিয়ে লোয়েস-পার্বি ও স্যাভিম্যানের মধ্যে কিছুটা তিক্ত মতবিরোধ হয়েছিল। স্যাভিম্যান জিতে যান, কারণ তিনি লোয়েস-পার্বির কাছ থেকে স্বীকার

করিয়ে নেন যে তিনি বুদাপেস্টে দুই মাস  
থাকলেও লিসবনে ছিলেন মাত্র দুই দিন।  
স্যাভিম্যান দুই শহরের প্রতিটিতেই চার বছর  
কাটিয়েছিলেন। লোয়েস-পার্বি হঠাৎ প্রসঙ্গ  
পাল্টে দিলেন।

“পুরোনো স্থাপনার কথা যখন উঠল,” তিনি  
বললেন, “আজটেক স্ট্রিট তদন্তে একটা অদ্ভুত  
বিষয় উঠেছিল। একটি পানশালায় কয়েকজন  
লোক উইচ স্ট্রিট কোথায় ছিল, তা নিয়ে তর্ক  
করেছিল।”

“মনে আছে,” লর্ড ভারমিয়ার বললেন।

“একেবারে হাস্যকর আলোচনা। আমার তো মনে  
হয়েছিল, চল্লিশ বছরের বেশি বয়সী যে কেউ  
ঠিকঠাক মনে করতে পারবে রাস্তাটি কোথায়  
ছিল।”

“আপনি বলবেন, সেটি কোথায় ছিল, স্যার?”  
লোয়েস-পার্বি জিজ্ঞেস করলেন।

“নিশ্চয়ই, চ্যান্সারি লেনের মোড় থেকে শুরু হয়ে  
পশ্চিম দিকে আইন আদালতের পর দ্বিতীয় গলির  
কাছে গিয়ে শেষ হতো।”

লোয়েস-পার্বি উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, এমন সময়  
স্যাভিম্যান গলা খাঁকারি দিয়ে তাঁর আত্মতুষ্ট,  
মসৃণ কণ্ঠে বললেন, “ক্ষমা করবেন, মাই লর্ড।  
প্যারিস, ভিয়েনা ও লিসবনের প্রতিটি ইট-পাথর  
আমি চিনি; কিন্তু লন্ডনকেই আমি নিজের বাড়ি  
বলে মনে করি। আমার লন্ডন-জ্ঞান আরও  
ভালো। উইচ স্ট্রিটের কথা আমার স্পষ্ট মনে  
আছে। ছাত্রাবস্থায় বই কিনতে সেখানে যেতাম।  
নিউ অক্সফোর্ড স্ট্রিটের সমান্তরালে, দক্ষিণ পাশে,  
তার ও লিংকনস ইন ফিল্ডসের মাঝামাঝি ছিল  
রাস্তাটি।”

স্যাভিম্যানের এই বক্তব্যে লোয়েস-পার্বি প্রচণ্ড  
ক্ষুব্ধ হলেন। প্রথমত, কথাটি ছিল সম্পূর্ণ ভুল,  
অথচ বলা হয়েছে অসহ্য আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে।  
দ্বিতীয়ত, লিসবন নিয়ে অপদস্থ হওয়ার ক্ষত  
তখনো তাঁর মনে টাটকা। তার ওপর হঠাৎ মনে  
পড়ল, একই বিষয় নিয়ে প্রধান বিচারপতি  
পেঙ্গামনের কাছে প্রকাশ্যে ধমক খেয়েছিলেন  
তিনি—যদিও দুই ক্ষেত্রেই তিনি জানতেন, তিনিই  
সঠিক। ঠিক, এই উইচ স্ট্রিট! তিনি স্যাভিম্যানের  
দিকে ফিরলেন।

“আরে, এসব বাজে কথা! পূর্বের শহরগুলো সম্পর্কে হয়তো আপনার কিছু জ্ঞান আছে; কিন্তু এমন কথা বললে বুঝতে হবে লন্ডন সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণাই নেই। উইচ স্ট্রিট এখনকার গেইটি থিয়েটারের একটু পূর্বে ছিল। পুরোনো গ্লোব থিয়েটারের পাশ দিয়ে স্ট্র্যান্ডের সমান্তরালে চলে গিয়েছিল।”

স্যাভিম্যানের কালো গোঁফ ওপরে উঠে গেল, হলদেটে দাঁতের সরু রেখা দেখা দিল। তাঁর মুখ থেকে অবজ্ঞা ও উপহাস মেশানো একটি শব্দ বেরোল। তারপর টেনে টেনে বললেন, “সত্যিই? কী অসাধারণ—এত ব্যাপক জ্ঞান!”

তিনি হেসে উঠলেন; তাঁর ছোট চোখ দুটি প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে স্থির হয়ে রইল। লোয়েস-পার্বির মুখ গাঢ় লাল হয়ে গেল। তিনি পোটের আধা গ্লাস এক ঢোকে পান করে প্রায় ফিসফিস করে বললেন, “কী নির্লজ্জতা!” তারপর যতটা অভদ্রভাবে সম্ভব, ইচ্ছা করেই স্যাভিম্যানের দিকে পিঠ ফিরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অ্যাডেলার সঙ্গে থেকে তিনি ঘটনাটি ভুলে থাকার চেষ্টা করলেন। ব্যাপারটা এতই হাস্যকর,

এতই মর্যাদাহানিকর! যেন তিনি জানেন না!  
আগের তর্কের পর জমে থাকা ছোট ছোট  
খোঁচার ফলেই শেষ পর্যন্ত তাঁর এমন রুঢ় আচরণ  
হয়ে গেল। স্যাভিম্যান নিজে গুরুত্বপূর্ণ নন—  
ধিক্ স্যাভিম্যানকে! কিন্তু ভবিষ্যৎ শ্বশুর কী  
ভাববেন? তাঁর সামনে এর আগে কখনো তিনি  
মেজাজ হারাননি। তিনি নিজেকে জোর করে  
হালকা, কিছুটা বোকাটে রসিকতার মেজাজে  
আনলেন। এমন সময় অ্যাডেলা তাঁর সবচেয়ে  
ভালো রূপে থাকতেন। ভবিষ্যতে তারা একসঙ্গে  
অনেক মজা করবেন। তাঁর প্রায় সুন্দর, খুব বেশি  
বুদ্ধিদীপ্ত নয় এমন মুখটি শিশুসুলভ আনন্দে  
টোল পড়ে উঠল। তাঁর কাছে জীবন ছিল নিছক  
এক বিরাট হাসিঠাট্টা। তারা বিখ্যাত অপেরা-  
গায়িকা টোকাটার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।  
তাঁকে কোভেন্ট গার্ডেন থেকে আসার জন্য  
বিপুল পারিশ্রমিকে আনা হয়েছিল। মিস্টার  
স্যাভিম্যান সংগীত খুব পছন্দ করতেন।  
অ্যাডেলা হাসতে হাসতে আলোচনা করছিলেন,  
মহান স্যাভিম্যানকে বসার জন্য কোন আসনটি  
সবচেয়ে সম্মানজনক হবে। হঠাৎ লোয়েস-  
পার্বির মনে এক অদ্ভুত সন্দেহ জেগে উঠল: শুধু  
হাসিঠাট্টা না করে, জীবনের কঠিন সময়ে এই  
নারী তাঁর কেমন স্ত্রী হবেন? সঙ্গে সঙ্গেই তিনি

সন্দেহের সেই ক্ষীণ, গোপন খোঁচাটি মন থেকে  
সরিয়ে দিলেন। ঘরের বিশাল অভিজাত্য তাঁর  
মন শান্ত করল। গাঢ় লাল গোলাপের বড় পাত্র  
তাঁর অনুভূতিকে তীক্ষ্ণ করল। তাঁর কর্মজীবন...।  
দরজা খুলল। কিন্তু টোকাটা নন; ঘরের এক  
পরিচারক। লোয়েস-পার্বি আবার তাঁর প্রেয়সীর  
দিকে ফিরলেন।

“ক্ষমা করবেন, স্যার। মহামান্য আপনাকে  
লাইব্রেরিতে দেখা করতে বলেছেন।”

বার্তাবাহকের দিকে তাকাতেই লোয়েস-পার্বির  
হৃদস্পন্দন দ্রুত হলো। অশুভ কিছুই অনিবার্য  
পূর্বাভাস তাঁর স্নায়ুকে কাঁপিয়ে দিল। কিছু একটা  
ভুল হয়েছে; অথচ ব্যাপারটা এতই তুচ্ছ, এতই  
হাস্যকর। সংকট এলে—তিনি ক্ষমা চাইতে তো  
পারেন। আত্মবিশ্বাসী হাসি দিয়ে অ্যাডেলাকে  
বললেন, “অবশ্যই, আনন্দের সঙ্গে। একটু  
অপেক্ষা করো, প্রিয়।” তিনি গম্ভীর চেহারার  
পরিচারকের পিছু নিলেন। লাইব্রেরির কার্পেটে  
পা রাখতেই বুঝলেন, তাঁর সবচেয়ে ভয়ংকর  
আশঙ্কাই সত্যি হতে যাচ্ছে। প্রথমে মনে হলো  
লর্ড ভারমিয়ার একা আছেন; তারপর কোণের  
আরামকেদারায় কুঁকড়ে পড়ে থাকা পুরোনো

চামড়ার মতো স্টিফেন গ্যারিটকে দেখতে  
পেলেন। দরজা বন্ধ হতেই লর্ড ভারমিয়ার  
ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে না বলে রাগে চিৎকার করলেন,  
“তুমি এসব কী করেছ?”

“ক্ষমা করবেন, স্যার। আমি বুঝতে পারছি না।  
স্যাভিম্যানের ব্যাপার?”

“স্যাভিম্যান চলে গেছেন।”

“আমি দুঃখিত।”

“দুঃখিত! ঈশ্বরের কসম, তোমার দুঃখিত হওয়াই  
উচিত! তুমি তাঁকে অপমান করেছ। আমার  
নিজের বাড়িতে আমার সম্ভাব্য জামাতা তাঁকে  
অপমান করেছে!”

“আমি সত্যিই দুঃখিত। বুঝতে পারিনি—”

“বুঝতে পারিনি! বসো, আর এক মুহূর্তের  
জন্যও ধরে নিয়ো না যে তুমি এখনো আমার  
সম্ভাব্য জামাতা। তোমার আচরণ শুধু তাঁর প্রতি  
নয়, আমার প্রতিও অসহনীয় ঔদ্ধত্য।”

“কিন্তু আমি—”

“আমার কথা শোনো। জানো কি, সরকার ওই ব্যক্তির সঙ্গে সুদূরপ্রসারী একটি চুক্তি সম্পন্ন করার একেবারে দ্বারপ্রান্তে ছিল? পরিস্থিতি ছিল একেবারে শেষ মুহূর্তের সিদ্ধান্তের মতো। আমরা যে ছাড় দিতে রাজি ছিলাম, তাতে রাষ্ট্রের তিন কোটি পাউন্ড খরচ হতো—তবু তা সস্তাই হতো। শুনছ? সস্তাই হতো! বঙ্কান সাম্রাজ্যের সবচেয়ে দুর্বল সীমান্ত-দুর্গগুলোর একটি। ভয়ংকর বিপজ্জনক এলাকা। কিছু শক্তি যদি আমাদের কর্তৃত্ব দখল করতে পারে—আর মনে রেখো, পুরো জায়গাটি ইতিমধ্যেই সেই নতুন, ক্ষতিকর মতবাদে জর্জরিত—তাহলে আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই গোটা পূর্বাঞ্চল আগুনে জ্বলবে। ভারত! ঈশ্বর! আমরা যে চুক্তি নিয়ে আলোচনা করছিলাম, তা এই আগ্রাসন ঠেকাত। আর তুমি, নির্বোধ, সেই লোকটিকেই অপমান করে বসেছ, যার কথার ওপর পুরো বিষয়টি নির্ভর করছে।”

“স্যার, এসব বিষয়ে আমার জানার কথা কীভাবে?”

“তোমার জানার কথা নয়? তুমি তো নিজেই যেন তাঁকে অপমান করার সুযোগ খুঁজছিলে! আমার

বাড়িতে বসে একটি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তাঁকে  
অপমান করলে!”

“তিনি বলেছিলেন, উইচ স্ট্রিট কোথায় ছিল তা  
জানেন। তাঁর কথা ভুল ছিল। আমি সংশোধন  
করেছি।”

“উইচ স্ট্রিট! থিক্ উইচ স্ট্রিট! তিনি যদি বলতেন  
উইচ স্ট্রিট চাঁদে ছিল, তাহলেও তোমার একমত  
হওয়া উচিত ছিল। তোমার এমন আচরণের  
কোনো দরকার ছিল না। আর তুমি নাকি  
রাজনীতিতে যেতে চাও!”

এই কথার মধ্যে যে তীব্র বিদ্বেষ ছিল, তা  
লোয়েস-পার্বির কানে গেল না। তিনি এতটাই  
বিচলিত ছিলেন যে বিড়বিড় করে বললেন,  
“আমি খুব দুঃখিত।”

“আমি তোমার দুঃখ প্রকাশ চাই না। বাস্তব কিছু  
চাই।”

“কী, স্যার?”

“সোজা মিস্টার স্যান্ডিম্যানের বাড়ি যাবে, তাঁকে  
খুঁজে বের করবে এবং ক্ষমা চাইবে। বলবে, উইচ

স্ট্রিটের ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত তিনিই সঠিক ছিলেন। আজ রাতে তাঁকে না পেলে আগামীকাল সকালে খুঁজবে। দুপুর বারোটা পর্যন্ত সময় দিলাম। এর মধ্যে তাঁকে যথাযথভাবে ক্ষমা না চাইলে এই বাড়িতে আর ঢুকবে না, আমার মেয়েকেও আর দেখবে না। তাছাড়া, যে পেশার মর্যাদা তুমি নষ্ট করেছ, সেখান থেকে তোমাকে তাড়িয়ে দিতে আমার সমস্ত প্রভাব কাজে লাগাব। এবার যাও।”

বিহ্বল ও কাঁপতে কাঁপতে লোয়েস-পার্বী নাইটসব্রিজের নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে গেলেন। কিছু করার আগে তাঁকে ভাবার সময় নিতে হবে। লর্ড ভারমিয়ার পরদিন দুপুর পর্যন্ত সময় দিয়েছেন। ক্ষমা চাইলে রাতভর চিন্তা করার পরই চাইবেন। তাঁর সত্তার মৌলিক মূল্যবোধ পরীক্ষা দেওয়ার সময় এসে গেছে—তিনি তা বুঝতে পারছিলেন। জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর গভীরে কোনো প্রবল স্বভাববোধ ভীষণভাবে অপমানিত হয়েছে। সাফল্যের জন্য কি এমন একটা সময় আসে, যখন মানুষকে নিজের আত্মা বিক্রিয়ে দিতে হয়? সবই এত হাস্যকরভাবে তুচ্ছ—একটি হারিয়ে যাওয়া রাস্তার অবস্থান নিয়ে সামান্য তর্ক। লর্ড

ভারমিয়ার যেমন বলেছিলেন, উইচ স্ট্রিট কোথায় ছিল, তাতে কীই-বা আসে যায়?

অবশ্যই তাঁর ক্ষমা চাওয়া উচিত। তা করতে ভীষণ কষ্ট হবে, কিন্তু একটি রাস্তা নিয়ে তুচ্ছ তর্কের কারণে কি মানুষ সবকিছু বিসর্জন দেবে?

নিজের ঘরে লোয়েস-পার্বি গাউন পরে, পাইপ ধরিয়ে আগুনের সামনে বসে রইলেন। সেই মুহূর্তে সঙ্গের জন্য—ঠিক উপযুক্ত সঙ্গের জন্য—তিনি যেকোনো কিছু দিতে রাজি ছিলেন। এমন একজন নারী থাকলে কী ভালোই না হতো, যাঁর সঙ্গে সবকিছু আলোচনা করা যায়; যিনি বুঝবেন, সহানুভূতি দেখাবেন। হঠাৎ তাঁর চোখে ভেসে উঠল অ্যাডেলার মুখ—টোকাটার আসন্ন আগমন নিয়ে খিলখিল করে হাসছেন। আবার সেই নিচু সন্দেহের কণ্ঠ কানে ফিসফিস করল। অ্যাডেলা কি সত্যিই সেই উপযুক্ত নারী? সত্যি বলতে, তিনি কি অ্যাডেলাকে ভালোবাসেন? নাকি সবই একটা তামাশা? জীবন কি নিছক তামাশা—আইনজীবী, রাজনীতিবিদ ও নানা লোকের খেলা?

আগুন নিভে আসছিল, কিন্তু তিনি ভাবতেই থাকলেন; তাঁর মন মূলত ভবিষ্যতের ঝলমলে দৃশ্যগুলোতেই আটকে ছিল। মধ্যরাত পেরিয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ তিনি নিচু স্বরে বললেন, “ধুর!” তারপর লেখার টেবিলের কাছে গিয়ে কলম তুলে চিঠি লিখলেন:

“প্রিয় মিস্টার স্যান্ডিম্যান, গত রাতে আপনার সঙ্গে যে রুঢ় আচরণ করেছি, তার জন্য আমাকে ক্ষমা চাইতেই হচ্ছে। কাজটি একেবারেই ক্ষমার অযোগ্য ছিল; বিশেষ করে, বিষয়টি খতিয়ে দেখার পর বুঝেছি উইচ স্ট্রিটের অবস্থান সম্পর্কে আপনিই সঠিক ছিলেন। কীভাবে আমি ভুল করেছিলাম, বুঝতে পারছি না। অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমা করবেন।

“আপনার আন্তরিক,

“ফ্রান্সিস লোয়েস-পার্বি।”

চিঠি লিখে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এবং ঘুমোতে গেলেন। মনে হতে পারত, এখানেই বিষয়টির শেষ। কিন্তু বিবেকের কিছু ছোট, লোভী দানব আছে, যাদের শান্ত করা সহজ নয়। তারা তাঁকে রাতের অর্ধেকেরও বেশি সময় জাগিয়ে রাখল।

তিনি বারবার নিজেকে বললেন, “এটা একেবারেই হাস্যকর!” কিন্তু ছোট্ট দানবগুলো বিছানার চারপাশে নাচতে লাগল, আর বিষয়টিকে দুটি স্পষ্ট প্রশ্নে ভাগ করে দিল। একদিকে বাহ্যিক জাঁকজমক; অন্যদিকে তার পেছনে লুকিয়ে থাকা গভীর, মৌলিক কিছু—যার নাম শুধু একটি শব্দে বলা যায়: সত্য। যদি তিনি সত্যিই অ্যাডেলাকে ভালোবাসতেন—যদি স্যাভিম্যান ভুল আর তিনি সঠিক, এ বিষয়ে এতটা নিশ্চিত না হতেন—তাহলে যে জায়গায় উইচ স্ট্রিট ছিল না, সেটিকে সেখানে ছিল বলে তাঁকে কেন লিখতে হবে? “সাফল্যের চেয়েও বেশি সুখ দেয় এমন কিছু কি নেই?” ছোট্ট দানবগুলোর একটি যেন বলল। “এ কথা স্বীকার করো, তাহলেই তোমাকে ঘুমোতে দেব।”

সম্ভবত এই ছোট্ট দানবগুলোর সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র এটাই। জীবন যতই পরিপূর্ণ হোক, আমরা সবাই শান্তির মুহূর্তের জন্য আকুল থাকি। আর বিবেক আমাদের সামনে সেই চূড়ান্ত প্রশান্তির এক আয়না ধরে রাখে। লোয়েস-পার্বী তখন আর নিজের স্বাভাবিক রূপে ছিলেন না। প্রাণবন্ত, আত্মবিশ্বাসী, উজ্জ্বল সেই আত্মকেন্দ্রিক মানুষটি প্রায় অসহনীয় যন্ত্রণায় ছটফট

করছিলেন—আর সবকিছুর সূত্রপাত হয়েছে  
একটি রাস্তা নিয়ে হাস্যকর তর্ক থেকে। ভোর  
তিনটা পনেরো মিনিটে তিনি গোঙাতে গোঙাতে  
বিছানা ছেড়ে উঠলেন, পাশের ঘরে গিয়ে মিস্টার  
স্যামুয়েলকে লেখা চিঠিটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো  
করে ফেললেন।

তিন সপ্তাহ পরে বৃদ্ধ স্টিফেন গ্যারিট প্রধান  
বিচারপতির সঙ্গে দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন।  
তঁারা পুরোনো বন্ধু; তাই কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়া  
তাদের কাছে কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না।  
খাবার ছিল চমৎকার, তবে পরিমিত। দুজনেই  
ধীরে ধীরে, চিন্তামগ্নভাবে খাচ্ছিলেন; পান  
করছিলেন শুধু পানি। মিষ্টান্ন পরিবেশনের আগে  
প্রধান বিচারপতি বিশেষ কোনো মন্তব্য করলেন  
না। তারপর তিনি সাম্প্রতিক একটি মামলার  
বিবরণ দিলেন, যেখানে তাঁর মতে  
সভাপতিত্বকারী বিচারক নজিরবিহীন  
যুক্তিবিকৃতির মাধ্যমে সাক্ষ্য-প্রমাণের আইন  
ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। স্টিফেন গভীর  
মনোযোগে শুনলেন। রুপোর থালা থেকে দুটি  
হ্যাজেলনাট নিয়ে না ভেঙেই চিন্তিতভাবে হাতে  
ঘোরাতে লাগলেন। বিচারপতি নিজের মতামত

পুরোপুরি ব্যাখ্যা করে নাশপাতির খোসা ছাড়ালে  
স্টিফেন বিড়বিড় করে বললেন:

“আমি সত্যিই খুব প্রভাবিত হয়েছি। আমার  
নিজের সীমিত পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রেও—আপনি  
বলতে পারেন, একজন বাইরের লোকের  
অভিজ্ঞতায়—যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ প্রতিষ্ঠা না করে  
কোনো বক্তব্য দেওয়ার ফলে কত সমস্যা সৃষ্টি  
হয়, তা বারবার দেখেছি। মানুষের মৃত্যু হয়েছে,  
সর্বনাশ ঘটেছে, অসীম দুর্ভোগ তৈরি হয়েছে।  
গত সপ্তাহেই এক তরুণের উজ্জ্বল কর্মজীবন  
প্রায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। মানুষ যথেষ্ট তথ্য ছাড়াই  
বক্তব্য দেয়...”

তিনি বাদামগুলো থালায় ফিরিয়ে রাখলেন।  
তারপর আপাতদৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক ভঙ্গিতে হঠাৎ  
জিজ্ঞেস করলেন, “মাই লর্ড, আপনার কি উইচ  
স্ট্রিটের কথা মনে আছে?”

প্রধান বিচারপতি গলা খাঁকারি দিলেন। “উইচ  
স্ট্রিট! অবশ্যই মনে আছে।”

“আপনি বলবেন, সেটি কোথায় ছিল?”

“কোথায় আবার—এখানেই তো!”

বিচারপতি পকেট থেকে পেনসিল বের করে  
টেবিলের কাপড়ের ওপর একটি নকশা  
আঁকলেন। “ওটা এখান থেকে ওখান পর্যন্ত  
গিয়েছিল।”

সিটিফেন চশমা ঠিক করে নকশাটি মনোযোগ  
দিয়ে পরীক্ষা করলেন। অনেকক্ষণ ধরে  
দেখলেন। শেষে তাঁর হাত স্বভাবতই বুকের  
পকেটের দিকে এগোল, যেখানে ছোট ছোট ঘর  
কাটা পাতার একটি নোটবই রাখতেন। কিন্তু তিনি  
থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। শেষ পর্যন্ত আইনের  
সঙ্গে তর্ক করে কী লাভ? আইন এমনই—  
চমৎকার এক ব্যবস্থা, অবশ্য ভুলের উর্ধ্বে নয়;  
প্রধান বিচারপতির নকশাটিও প্রায় এক-চতুর্থাংশ  
মাইল ভুল ছিল। তবু আইন অসাধারণ, বিস্ময়কর  
একটি জিনিস। তিনি নিজের হাড়-উঁচু আঙুলের  
গাঁটের দিকে তাকিয়ে সামান্য হাই তুললেন।

“আপনার মনে আছে তো?” প্রধান বিচারপতি  
জিজ্ঞেস করলেন।

সিটিফেন বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়লেন। তাঁর  
কণ্ঠস্বর যেন বহু দূর থেকে ভেসে এল: “হ্যাঁ, মাই

লর্ড, মনে আছে। ওটা ছিল বিষণ্ণ এক ছোট  
রাস্তা।”

---

**মূল বই:** *The Best British Short Stories of  
1922*

সম্পাদক: এডওয়ার্ড জে. ও'ব্রায়েন ও জন  
কর্নোস